<u>ভূমিকা</u>

বাংলা স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম সেমেস্টারের PGBNG-CC-1-3 পত্র— 'প্রাগাধুনিক সাহিত্য-১'-এর মডিউল-২-এর পঠিত বিষয়—

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন— বড়ু চণ্ডীদাস (বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত গ্রন্থ)— নির্বাচিত পদসমূহ— ৭, ৮, ১৪, ১৭, ১২৪, ১৭২, ১৮৯, ২২৪, ২৩২, ২৪৯, ২৫৬, ২৭৯, ২৯৬, ৩১০, ৩২৩, ৩৩৬, ৩৪৯, ৩৫৪, ৩৯৭, ৪১২।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত বর্তমান সহায়ক আলোচনার উদ্দেশ্য— বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য যুগের একমাত্র প্রাপ্ত সাহিত্যিক নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য সম্পর্কে সাধারণ পরিচয় প্রদান। এখানে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আলোচ্য বিষয়গুলি হল—

- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সাধারণ পরিচয়— আবিষ্কার, প্রকাশ ইত্যাদির পরিচয়
- গ্রন্থের নামকরণ বিষয়ক বিতর্ক
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কাহিনি বা আখ্যান
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' প্রতিফলিত তৎকালীন বঙ্গদেশের সমাজচিত্র

— উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের বিস্তারিত জানার জন্য বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য', সত্যবতী গিরির 'বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

— ড. মানস কবি
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ
ও
বারসার,
আশুতোষ
কলেজ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

১৩১৬ বঙ্গাব্দে (ইং. ১৯০৯) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য মহাপ্রভুর দৌহিত্রবংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরের মাচার উপর ধামাভরা একরাশি পুথির মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের পুথিটি আবিষ্কার করেন। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু – রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (ইং. ১৯১৬) বসন্তরঞ্জন রায়েরই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে পুথিটি প্রকাশিত হয়।

নামকরণ ঃ-

১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রি.) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের আবিষ্কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথিটি খণ্ডিত ছিল – তার প্রথম দুটি পাতা ছিল না। শেষের পাতাগুলি মেলেনি। মাঝের কিছু পাতাও হারিয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রাপ্ত পুথিতে কোথাও নাম মেলেনি।

'চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন লিখেছিলেন' – এই প্রবাদটিকে মেনে নিয়ে, এই কাব্যের মধ্যে কৃষ্ণের লীলা-কীর্তন দেখে, তিনি নিজেই এর নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। তারপর ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রি.) কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' থেকে তিনি পুথিটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামেই সম্পাদনা করেন। এই নামটি দেওয়ার পক্ষে তাঁর যুক্তি হল ঃ-

> ''পুথির আদ্যন্তবিহীন খণ্ডিতাংশে কবির দেশকালাদির কথা দূরে থাকুক, পুথির নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। কথিত হয়, চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন। খেতরীর এক বার্ষিক উৎসবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গীত হইয়াছিল, অবশ্য কীর্তনাঙ্গে। আলোচ্য পুথির প্রতিপাদ্য যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কীর্তন, তাহাতে তর্কের অবসর নাই। অতএব গ্রন্থের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামকরণ অসমীচীন নয়।'' (চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা)

বসন্তরঞ্জনের দেওয়া 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উঠেছে তার প্রধান কারণ দুটি, যথা –

(ক) পুথিতে প্রাপ্ত রসিদে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' নাম।

(খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামের 'কীর্তন' নামটি কাব্যস্বরূপের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। কেন-না, কাব্যটি 'আদিরুচি-সম্পন্ন', সম্পূর্ণ 'দেহভোগের' কাব্য।

– এই মতের পক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন রমেশ বসু, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, বিমানবিহারী মজুমদার, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।

রমেশ বসুর ভাবনায় প্রাপ্ত পুথির নাম 'শ্রীকৃষ্ণপুরাণ' হলে ভাল হত। বিমান বিহারী মজুমদার বড়ু চণ্ডীদাসকে পদাবলীর চণ্ডীদাস বলে মানেন নি। তাঁর ভাবনায় পুথিটির নাম 'রাধাকৃষ্ণধামালী' হলেই যথার্থ হত। তেমনি নলিনীনাথ দাশগুপ্তের মতে এর নাম 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' হলে সমস্ত আশঙ্কার অবসান হত। এঁরা সবাই একমত যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রুচি রক্ষিত হয়নি, বৈষ্ণবাদর্শ বিঘ্নিত হয়েছে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য – এঁদের মতে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আলগা করে রাখা চিরকুট অনুসারে পুথির নাম হওয়া উচিত 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের নামকরণ বিষয়ে পণ্ডিত ও গবেষক মহলে বিতর্ক রয়েছে। বসন্তরঞ্জন লোকঐতিহ্য মেনে এই গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন বলে মনে হয়। ড. সুকুমার সেন মহাশয়ও তাই মনে করেন –

> ''প্রাচীন বৈষ্ণবলেখকদের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া আবিষ্কর্তা-সম্পাদক বসন্তরঞ্জন নাম দিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।''
>
> ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড)

তবে সবশেষে এই কথা বলতে হবে যে, যদি কোনোদিন বড়ুচণ্ডীদাসের এই পুথির অন্য কোনো নতুন প্রতিলিপি আবিষ্কার হয়, তবেই এই পুথির নামকরণ বিতর্কের অবসান হবে।

রচনাকাল ঃ

চণ্ডীদাস রচিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যটি চৈতন্যদেব সপার্ষদ আনন্দের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে চারবার লিখেছেন যে, চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের গীত আস্বাদন করতেন –

(i) ''বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত।।''

(আদিলীলা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

(ii) ''চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি

কর্ণামৃত শ্রী গীতগোবিন্দ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে

গায় শুনে পরম আনন্দ।।”

(মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

(iii) “বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রী গীতগোবিন্দ।

এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ।।”

(মধ্যলীলা, দশম পরিচ্ছেদ)

(iv) “বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রী গীতগোবিন্দ।

ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে যায় রামানন্দ।।”

(অন্ত্যলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ)

এছাড়াও চৈতন্যদেবের কৃপালাভধন্য জয়ানন্দের লেখা ‘চৈতন্যমঙ্গল’-এ কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে। জয়ানন্দ তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের যে বন্দনা করেছে, তার মধ্যে জয়দেব ও বিদ্যাপতি – চৈতন্য-পূর্ববর্তী এই দু’জন কবির সঙ্গে তিনি একই সঙ্গে চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ করেছেন –

“জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ।।”

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও জয়ানন্দের সাক্ষ্য থেকে সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, চৈতন্যদেবের (চৈতন-জন্ম ১৪৮৬ খ্রিঃ) আগে চণ্ডীদাস নামে একজন কবি ছিলেন এবং তিনি জয়দেব ও বিদ্যাপতির মত ‘শ্রীকৃষ্ণচরিত্র প্রকাশ’ করে ‘গীত’ লিখেছিলেন।

১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে যে নবাবিষ্কৃত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্যটি প্রকাশিত হয়, তার আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ তার নামকরণ করেন ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। এবং এই গ্রন্থের লেখকও একজন চণ্ডীদাস।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বিশিষ্ট গবেষকরা প্রায় সকলেই এক বাক্যে রায় দিয়েছিলেন যে, এই কাব্য খুব প্রাচীন এবং নিঃসন্দেহে চৈতন্য- পূর্ববর্তীকালের রচনা।

প্রাচীন লিপি-বিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এর বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, এর মধ্যে তিন ছাঁদের লিপি আছে – তার মধ্যে একটি ছাঁদ বেশ প্রাচীন ধরনের। এবং এই প্রাচীন ছাঁদের লিপি ১৩৮৫ খ্রিস্টাব্দের বাংলা লিপির চেয়েও পুরোনো। সুতরাং এই পুথি তারও আগে – সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লেখা হয়েছিল। অন্যান্য লিপি বিশারদরাও এই পুথিকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালের লেখা বলেই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ - এর ভাষাও খুব পুরোনো ধরনের; এই ভাষার এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা চৈতন্য-পরবর্তী যুগের বাংলা ভাষায় দেখা যায় না। এর ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিচার করে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘Origin and Development of Bengali Language’ নামক গ্রন্থে আলোচ্য কাব্যের ভাষাকে আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার (আনুমানিক ১২০০-১৫০০ খ্রি) একমাত্র নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

পুথিটির লিপিকাল সম্বন্ধে আরো অনেক বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। ড. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই পুথি ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হয়েছিল। ড. রাধাগোবিন্দ বসাকের ধারণা – পুথিখানির লিপিকাল ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। যোগেশচন্দ্র রায় ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ এর আবিষ্কার-ক্ষেত্র বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত বহু পুথির লিপি-বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন – এই পুথির লিপিকাল ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে নয়। তাঁর মতে কেন্দ্রীয় প্রদেশের তুলনায় প্রত্যন্ত দেশের লিপি ও ভাষায় প্রাচীনতার ছাপ সব সময়েই বেশি মনে হয়।

কাহিনি ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ যে চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা তা নিশ্চিন্তে বলা চলে। এই কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয় কাহিনির মধ্যে পৌরাণিক প্রেক্ষাপট স্থাপিত হয়েছে বটে, তবে লোক জীবনের আদর্শ, স্থূলরীতি, গ্রাম্যতা ও ক্লেদক্লিন্নতা প্রকাশ পেয়েছে বেশি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রাধা-কৃষ্ণ কাহিনির সঙ্গে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের কোন সাদৃশ্য নেই। এই কাব্যে আদিরসের প্রাধান্য। রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই – এই তিন জনের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কাহিনির পরিণতি ঘটেছে। লৌকিক কৃষ্ণযাত্রা বা কৃষ্ণকথার গ্রামীণ আদর্শে গড়ে উঠেছে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য। অধিকাংশ স্থানে কবি গ্রাম্য রুচির দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। কাব্যের কাহিনিতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধা প্রথমে খুব বিরূপ, কিন্তু পরে তিনি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একান্তভাবে কৃষ্ণানুরাগী হয়ে উঠেছেন। চৈতন্যোত্তর যুগে রাধা জন্ম থেকে কৃষ্ণময়ী ও মহাভাবস্বরূপিণী। কিন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ কৃষ্ণের রাধার প্রতি অনুরাগই বর্ণিত হয়েছে। রাধার পূর্বরাগ সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরে। রাধা চরিত্রের এই অভিনবত্ব ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র প্রাচীনতাই প্রমাণ করে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে রচিত।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র রচনা কবে হয়েছিল তা সঠিক জানার উপায় নেই। কারণ গ্রন্থের মধ্যে রচনাকালের কোন নির্দেশ নেই। লিপি

বিচারক পণ্ডিতরা এই রচনাকে চর্তুদশ শতকের বলে মনে করেন। তবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে গ্রন্থটিকে চৈতন্য-পূর্ব যুগের রচনা বলে নিঃসন্দেহে ধরা যায়।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কাহিনি / আখ্যান

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশনার (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) অব্যবহিত পর হতেই এ-কাব্যের কাহিনি, কাব্যমূল্য ও কবির রুচি নানা জনের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। কেউ কেউ এই কাব্যকে শিল্পোৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে গ্রহণ করেছেন, কেউ বা একে গ্রাম্য বর্বরতার নরকবিশেষ বলতে চেয়েছেন।

পুথিটির আদ্যন্ত এবং মধ্যের কিছু অংশ খণ্ডিত হলেও বর্ণিত ঘটনার ধারা অনুসরণ কিছুমাত্র দুরূহ নয়। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাই এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য। কৃষ্ণের জন্ম হতে আরম্ভ করে মথুরাগমন, মথুরা হতে ক্ষণিকের জন্য প্রত্যাবর্তন এবং রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলনের পর কংস ধ্বংসের জন্য কৃষ্ণের মথুরায় গমন ও রাধার বিলাপ – এইখানেই পুথি খণ্ডিত।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মোট ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত – জন্ম খণ্ড , তাম্বুল খণ্ড , দান খণ্ড , নৌকা খণ্ড, ভার খণ্ড, ছত্র খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়দমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড, বংশী খণ্ড ও রাধাবিরহ। শেষ সর্গ বা 'রাধাবিরহ'-এ 'খণ্ড' নাম যুক্ত হয় নি। এই জন্য কেউ কেউ মনে করেন, এই শেষাংশ বোধ হয় বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা নয়, তিনি রচনা করলে একে 'খণ্ড' নামে অভিহিত করতেন।

জন্ম খণ্ড ঃ এই খণ্ডে দেবগণের প্রার্থনায় ভূভার হরণের জন্য রাধাকৃষ্ণের জন্মকাহিনি বর্ণিত। বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপে বাসুদেবের পুত্র হয়ে জন্ম, বৃন্দাবনে নন্দালয়ে স্থানান্তরিত। কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য লক্ষীদেবীর সাগর গোয়ালার ঘরে তার পত্নী পদুমার গর্ভে রাধারূপে জন্ম।

তাম্বুল খণ্ড ঃ এই খণ্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বড়াইয়ের মারফতে কামাচার আমন্ত্রণসূচক তাম্বুলাদি রাধাকে উপহার-প্রেরণ – এটাই শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ। স্বরূপবিস্মৃত রাধাচন্দ্রাবলী কর্তৃক তা সব্যঙ্গে প্রত্যাখ্যান এবং বড়াইকে অপমান।

দান খণ্ড ঃ এখানে কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের রাধা লাভে ষড়যন্ত্র এবং দানী সেজে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার দধিদুগ্ধ বিনষ্ট, রাধাকে বলপূর্বক সম্ভোগ।

নৌকা খণ্ড ঃ এই খণ্ডে কৃষ্ণের কাণ্ডারীবেশে গোপীগণকে যমুনা পারকরণ এবং নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে রাধাকৃষ্ণের জলবিহার – রাধার প্রতিকূল বা বাম্যভাব পরিত্যাগ।

ভার খণ্ড ঃ এখানে ভারবাহীরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধার দধিদুগ্ধপসরা বহন।

ছত্র খণ্ড ঃ এই খণ্ডে রাধার আতপনিবারণার্থ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ছত্রধারণ এবং রাধা কর্তৃক 'রতিদানের' আশ্বাস প্রদান।

বৃন্দাবন খণ্ড ঃ এই খণ্ডে গোপীসহ কৃষ্ণের বনবিলাস ও রাধাকৃষ্ণের মিলন – একে রাস বলা যেতে পারে।

যমুনা খণ্ড ও কালিয়দমন ঃ যমুনা খণ্ডান্তর্গত অংশে কৃষ্ণের কালিয়দমন, যমুনা খণ্ডে গোপীগণসহ কৃষ্ণের জলবিহার এবং কৃষ্ণ কর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ।

হার খণ্ড ঃ এই খণ্ডে রাধার হার অপহরণের জন্য যশোদা সমীপে কৃষ্ণের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে রাধার অভিযোগ।

বাণ খণ্ড ঃ ক্ষুব্ধ কৃষ্ণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাধার প্রতি মদনবাণ-নিক্ষেপ, রাধার মূর্চ্ছা, কৃষ্ণের অনুতাপ, ক্ষুব্ধ বড়াই কর্তৃক কৃষ্ণকে বন্ধন, কৃষ্ণের সকাতর অনুনয়, বন্ধনমোচন – পরে রাধার চৈতন্য-সম্পাদন এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন।

বংশী খণ্ড ঃ এখানে বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার উৎকণ্ঠা, বড়াইয়ের উপদেশে রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের বংশী-অপহরণ, কৃষ্ণের অনুনয়-বিনয়ে রাধার বংশী-প্রত্যর্পণ।

রাধাবিরহ ঃ এখানে রাধার বিরহ, রাধাকৃষ্ণের মিলন, রাধার শ্রান্তিজনিত নিদ্রা, সেই অবকাশে কৃষ্ণের কংস বিনাশার্থ মথুরাযাত্রা। (মূল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথি এখানেই খণ্ডিত।)

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের সাহিত্য-মূল্য / কাব্যগুণ –

ভাষার নিরিখে বাসলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাস একজন প্রাচীন কবি। শুধু প্রাচীন কবি নন, একজন শক্তিমান কবি। তিনি বহুশাস্ত্রে সমান অভিজ্ঞ। সঙ্গীত শাস্ত্রেও তিনি দক্ষ। উপরন্তু তিনি পরিচিত ছিলেন প্রত্যক্ষ লোকজগতের সঙ্গে। তাঁর বাস্তবদৃষ্টিও অসাধারণ। সর্বোপরি কল্পনার মৌলিকত্বে তাঁর দান অভিনবত্বের দাবী রাখে। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সেই প্রত্যূষ-যুগে কাহিনিকল্পনায়, চরিত্র সৃষ্টিতে এবং 'পয়ার ছন্দে'র বিবিধ রূপ নির্মাণে বড়ু চণ্ডীদাস যে বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাঁর কাব্যের সাহিত্যমূল্য বা কাব্যগুণ, গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল।

পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান

পৌরাণিক পটেই বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি যে বিশেষ কোন পুরাণকেই অনুসরণ করেছেন, তা নয়। কৃষ্ণ-জন্মের প্রস্তাবনায় বড়ু 'বিষ্ণুপুরাণে'র পটটি গ্রহণ করেছেন।

বড়ু কৃষ্ণলীলার ঘটনা-বিন্যাসে পুরাণের ক্রম লঙ্ঘন করেছেন। সব পুরাণেই আগে কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ, তৎপরে রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে। বড়ুর কাব্যে প্রথমে রাস অর্থাৎ বৃন্দাবনকুঞ্জে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন, তারপরে কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ পালা স্থান পেয়েছে।

বড়ু চণ্ডীদাস শুধু সংস্কৃত পুরাণ নয়, লৌকিক পুরাণেও অভিজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় ভার খণ্ড , ছত্র খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড-এর উল্লেখ কোন সংস্কৃত পুরাণে নেই। এই খণ্ডগুলির কাহিনি ও ঘটনা লোক-পুরাণ থেকেই সমাহৃত। অথবা এমনও হতে পারে বড়ু নিজেই নতুন 'Myth Makers' হয়ে এই কাহিনিগুলি কল্পনা করে নবপুরাণ সৃষ্টি করেছেন।

'গীতগোবিন্দে'র প্রভাব

জয়দেব ও বড়ু চণ্ডীদাসের ভিতর নানাদিক থেকে অমিল থাকলেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনায় বিশেষ করে 'বৃন্দাবন খণ্ড' ও 'রাধাবিরহ' রচনায় বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের নিকট ঋণী। বড়ু বৃন্দাবন খণ্ড রচনায় জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ সর্গ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং চতুর্থ সর্গের রাধাবিরহের বর্ণনাকে প্রয়োগ করেছেন 'রাধাবিরহ' রচনায়। তবে বৃন্দাবন খণ্ডেও কাহিনির উপস্থাপনায় বড়ু চণ্ডীদাস স্বতন্ত্র।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অনেকগুলি পদ 'গীতগোবিন্দে'র অনুবাদ। এখানে শুধু কবি হিসেবে নয়, অনুবাদক-কবি হিসাবেও বড়ু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

আখ্যানধর্মিতা

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কাহিনি গড়ে উঠেছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকথাকে কেন্দ্র করে মোট তেরোটি খণ্ডে। প্রতিটি খণ্ডের সঙ্গে পারস্পরিক যোগসূত্র বর্তমান। কাহিনির প্রারম্ভে কৃষ্ণের প্রতি বিরূপা রাধা কিছুতেই কৃষ্ণের কাছে ধরা দিতে চাননি। বড়াই-এর মধ্যস্থতা ও প্রলোভনও রাধাকে বিচলিত করতে পারেনি। অথচ কৃষ্ণ রাধার রূপের কথা শুনে তাঁকে পাওয়ার জন্য চঞ্চল। তাই নানা কৌশলে ও জোরপূর্বক তিনি তাঁকে সম্ভোগের চেষ্টা করেছেন। এর ফলে রাধা তাঁর চিত্তের প্রতিকূলতা সরিয়ে ক্রমশ কৃষ্ণমুখী হয়ে উঠেছেন। এই কাহিনির মধ্যে দানা বেঁধেছে আখ্যানরস।

গীতিধর্মিতা

গীতিকবিতার লক্ষণ যদি 'একলা মনের কথা' হয় তবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্যে গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যেমন, বংশী খন্ডে রাধার উক্তি –

> ''কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
> কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।''

কৃষ্ণ বিরহে রাধা যা করতে চেয়েছেন তাও গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তিনি বলেছেন -

> ''এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই আসার।
> ছিন্ডিয়া পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।।''

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' যেহেতু সুরের প্রাধান্য এবং বিভিন্ন খণ্ডে রাগ-রাগিনী ও তাল, লয়ের উল্লেখ আছে তাই এই গ্রন্থে যে প্রাচীন গীতিকবিতার গীতিধর্মিতা রয়েছে তা বলা যায়। এই গীতিধর্মিতার কারণে এই গ্রন্থে 'ঝুমুর গান', 'জাগের গান', 'ধামালি'র লক্ষণ আছে বলে সমালোচকগণ মনে করেন।

'Judgement in Literature' গ্রন্থের লেখক - সমালেচক W. Basil Worsfold 'Lyric Poetry'-র পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন –

> "The term (lyric) has come to signify any outburst in song which is composed under a strong inpulse of emotion or inspiration."

– এই উক্তি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বেশ কিছু পদ সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

নাট্যধর্মিতা

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের একটি প্রশ্নাতীত বড় লক্ষণ তার নাট্যরস। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অবশ্যই কাহিনি-কাব্য। তাছাড়া, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' যেহেতু উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক রীতিতে রচিত তাই এই কাব্যে নাটকীয়তার লক্ষণ প্রকট। দ্বন্দ্ব যদি নাটকের প্রাণ হয় তাহলে রাধা চরিত্রের মধ্যে রয়েছে নাটকীয়তা। প্রতিটি ঘটনার সংলাপের মাধ্যমে কবি এমন নাটকীয় চমক দিয়েছেন যে পরবর্তী ঘটনা জানার জন্যে আমাদের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ড. সুকুমার সেনের মতে, ''শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্য নাট্য-গীতিকাব্য।''

'রাধাবিরহে' কৃষ্ণ যখন রাধার শত অপরাধের উল্লেখ করে বড়াইয়ের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে তখন বড়াই তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলেছে –

''ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদরাহ কেহ্নে।।''

– এইরূপ বাকচাতুর্যে শুধু যে বড়াই চরিত্রটি প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠেছে তাই নয়, নাট্যরসও নিবিড় হয়েছে।

সমাজচিত্র

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মূলত লৌকিক প্রেমের কাব্য। তাই লোকজীবন তথা সমকালীন সমাজের বাস্তবজীবনকে যে বড়ু চণ্ডীদাস অনুসরণ করবেন, তা বলা যায়। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, চর্তুদশ ও পঞ্চদশ' শতকের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। সমকালীন লোকজীবনের ধারা, সমাজবিন্যাস স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে কাব্য-মধ্যে। যেমন –

ক) বৃত্তিনির্ভর জনজীবনের পরিচয় – গোপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কুমার, তেলী, নাপিত, বৈদ্য প্রভৃতি।

খ) যৌথ পরিবারের চিত্র – রাধা, স্বামী আইহন, শাশুড়ী, বৃদ্ধা বড়াই প্রমুখকে কেন্দ্র করে পারিবারিক পরিমণ্ডল।

গ) সমকালীন জীবনের লোকবিশ্বাস - সুতীর্থে তপস্যা বা স্নান করলে প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়। বৃন্দাবন খণ্ডে দেখা যায় –

''কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্যনারী।
যা লঞাঁ সুখরতি ভুঁজয়ে মুরারী।।''

চরিত্র - চিত্রণ

রাধা চরিত্র-চিত্রণে লেখকের মুন্সিয়ানার ছাপ সর্বত্র। বড়ুর রাধা রক্তমাংসে গঠিত। সাধারণ মানবী থেকে কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকায় পরিণত হয়েছেন। কৃষ্ণ চরিত্রের ঐশ্বর্যরূপ চিত্রণে অসংলগ্নতা থাকলেও রাধার বিপরীতধর্মী চরিত্র হিসেবে কৃষ্ণ চরিত্রের অঙ্কন যথাযথ। আর বড়াই সেকালের দূতী নয়, তিনি স্নেহশীলা অভিভাবিকা।

শব্দপ্রয়োগ

'চর্যাপদে'র পরই ভাষাগত পরিণতির সার্থকরূপ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' দেখতে পাওয়া যায়। এই কাব্যগ্রন্থখানিই আদি-মধ্যযুগের বাংলার একমাত্র নিদর্শন। পণ্ডিতেরা সকলেই একমত হয়েছেন যে, লোকমুখের ভাষা চয়নে বড়ুর কৃতিত্ব অসামান্য। এই কাব্যে এমন বহু শব্দ ও বাক্য আছে, যেগুলি একেবারে গ্রাম্য শব্দ। যেমন –

i) 'জলেতে নাম্বিলী <u>লাঙ্গট</u> হআঁ'
ii) '<u>সুখান</u> ডালেতে বসি কাক <u>কাঢ়ে</u> <u>রাএ</u>'
iii) 'কে জালে <u>ফুঁ</u> কে'
iv) 'এবেঁ <u>ঝাঁট</u> আন'
v) '<u>মাঙ্গে</u> সুরতী'
vi) 'গরু রাখি <u>বুল</u> তোহ্মে'

এছাড়া, এই কাব্যে কতিপয় আরবী ও ফারসি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় এবং অনার্য ভাষা হতে আগত কতকগুলি শব্দও পাওয়া যায়। যেমন –

i) <u>আরবী-ফারসি শব্দ</u> ঃ মজুরিয়া, মজুরী, কামান, খরমুজা, পসরা, বাকী প্রভৃতি।
ii) <u>দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর শব্দ</u> ঃ অগরু, অনল, কাল, চন্দন, পণ, নীর ইত্যাদি।
iii) <u>কোল গোষ্ঠীর শব্দ</u> ঃ কদলী, তাম্বুল, ডমরু, লগুড় ইত্যাদি।

অলংকার যোজনা

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে অলংকারের পারিপাট্য চোখে পড়ে। কখনো বক্তব্য উপস্থাপনে, কখনো ঘটনা বর্ণনায়, কখনো বা কোনো চরিত্রের রূপ বর্ণনায় বা মনের আবেগ প্রকাশে তিনি অলংকারের পর অলংকার সাজিয়েছেন। অনুপ্রাস, উপমা, উৎপেক্ষা, রূপক, দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেক প্রভৃতি বিচিত্র অলংকারে বড়ু তাঁর কাব্যকে শ্রুতিনন্দন, মনোরঞ্জক ও রমণীয় করে তুলেছেন। তবে উপমা নির্মাণেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। যেমন – গ্রামজীবন থেকে তুলে আনা অজস্র উপমার মধ্যে কয়েকটি চয়ন করা হল ঃ

i) 'যৌবন গড়িলে তোর তনু হবে লাউ।'

ii) 'তোহ্মার যৌবন রাধা কৃপিণের ধন।'

iii) 'তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন নদীকের বাণে।'

iv) 'মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পাণী।'

ছন্দ-মাধুর্য

সমগ্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে ছন্দের কারুকার্য রয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষায় মধ্যযুগ (১৪-১৮ শতক) এবং আধুনিক যুগের বাংলা কাব্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ছন্দরীতি অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্তের প্রাথমিক নিদর্শন পাওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বেশিরভাগ পদগীত ৮/৬ মাত্রার দ্বিপদী বা পয়ারবন্ধে রচিত হয়েছে। পয়ার ছাড়া, লঘু (৬/৬/৮) এবং দীর্ঘ (৮/৮/১০) ত্রিপদীও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন –

১ ১১ ১২ ২ ১১২ ১১
''ভাঁগিল সোনার ঘট / যুড়ীবাক পারী। ৮+৬
১২ ১২ ১১ ১১১১১১
উত্তম জনের নেহা / তেহেন মুরারী।।" (পয়ার) ৮+৬

প্রবাদ-প্রবচন

কাব্যদেহের অনুপমত্ব সৃষ্টিতে অনেকেই প্রবাদ-প্রবচনের উপর গুরুত্ব দেন। সে দিক দিয়ে এই কাব্য প্রবাদে প্রবাদে ঠাসা। প্রতিটি প্রবাদে বড়ুর অসামান্য জীবন অভিজ্ঞতা, সমাজ পর্যবেক্ষণ ও গভীর রসবোধের নিদর্শন। যেমন –

i) 'ললাট লিখিত খন্ডন না জাএ।'

ii) 'পরধন দেখিলেঁ কি পাত্র ভিখারী।'

iii) 'মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী।'

iv) 'পোত্রর মুখে পরবত টলে।'

v) 'কাটিল ঘাঅত লেম্বু রস দেহ কত।'

আধ্যাত্মিকতা

বাহ্যত স্থূলতা ও অশ্লীলতা থাকা সত্ত্বেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কতকগুলি পদে গভীর সৌন্দর্যবোধ ও শালীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলো পদ স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, সেখানে বিশুদ্ধ উচ্চভাব ও কবির মৌলিক কল্পনাশক্তির পরিচয় রয়েছে। এই পদগুলি ইঙ্গিতধর্মী ও আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত। যেমন –

i) ''মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী।।"
(রাধাবিরহ)

ii) ''আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ।।"
(রাধাবিরহ)

– এই জাতীয় রসোত্তীর্ণ পদগুলির মধ্যে পদাবলীর রাধার 'মহাভাবময়ী' রূপটি প্রত্যক্ষ করা যায়। এখানে ভক্তিতত্ত্বের বীজও নিহিত হয়ে আছে।

মানবিক আবেদন

মনুষ্য চরিত্রের অলিতে গলিতে বড়ুর বিচরণ। প্রেম-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর সুনিপুণ অভিজ্ঞতা ছিল। তাই তাঁর রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনিতে খাঁটি মানবিক রস স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। তুলনাহীন মানবরস প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনুপম সৃষ্টি রাধা চরিত্রকে ঘিরে।

নাবালিকা রাধার মধ্যে কবি যেমন ভীরুতা, লজ্জা, প্রবল প্রতিবাদ ও আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিয়েছেন, তেমনি রাধার মধ্যে প্রথম মিলনের শিহরণ ও পুলক চমৎকার রূপে বড়ু প্রকাশ করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কবিত্ব এইখানেই অনন্য-অসাধারণ।

হাস্যরসের উপস্থিতি

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' শৃঙ্গার রসের কাব্য, করুণ বিপ্রলম্ভ বেদনায় তার সমাপ্তি। কিন্তু বড়ু অত্যন্ত সচেতনভাবে কাব্যমধ্যে হাস্যরসাত্মক দৃশ্য যোজনা করে গম্ভীর রসের পাশে হাস্য বা লঘুরসকে স্থান দিয়ে তাঁর কাব্যকথাকে অধিকতর উপভোগ্য করে তুলেছেন। 'জন্ম খণ্ড' থেকে 'রাধাবিরহ' প্রত্যেকটি খণ্ডের মধ্যেই হাস্যরসের উপস্থিতি রয়েছে।

উত্তরাধিকার

একটি কাব্য তখনই সার্থক কাব্য বলে বিবেচিত হয় যখন দেখা যায় কাব্যটি পরবর্তীকালে তার উত্তরাধিকার সৃষ্টি করতে পেরেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পরবর্তীকালের বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। একথা অনস্বীকার্য যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র যেখানে সমাপ্তি, বৈষ্ণব পদাবলীর সূচনা সেখান থেকেই। 'বংশী খণ্ড' ও 'রাধাবিরহ' অংশে কৃষ্ণগতপ্রাণা ও কৃষ্ণসর্বস্ব রাধিকার যে ভাবময়ী রূপটি দেখা যায়, পদাবলী সাহিত্যের কোনো কোনো অংশে – পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার বা বিরহে যেন তার প্রতিধ্বনি আছে।

শেষ কথা

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পুথি, কবিজীবন, ভাষা, রচনাকাল ইত্যাদি বিষয় বর্তমান কালেও গবেষক মহলে সমান আদৃত। তাই বলতেই হবে, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য বাংলা সাহিত্যের অসামান্য সৃষ্টি। তাঁর অসামান্য কবিব্যক্তিত্ব প্রশ্নাতীত ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই কাব্য নিয়ে নানা তর্ক বা সমস্যা থাকলেও এই গ্রন্থের সাহিত্য-মূল্য ও ঐতিহাসিক-মূল্য অপরিসীম।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের সমাজচিত্র

‘Literature is the mirror of the society’ – সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সাহিত্যিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক চিন্তা-চৈতন্যের প্রকাশ, সমাজের প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন ঘটবেই, কারণ তিনি সামাজিক মানুষ। আর যে সাহিত্য আখ্যানধর্মী, কাহিনি যার প্রাণ, যা গল্পরসের যোগানদার, সেরকম রচনায় সমাজ না এসে পারে না। সেই রকম রচনায় মানুষের পরিবার-সমাজ, এমনকি রাষ্ট্রজীবনের অনেক কথাও চিত্রিত হয়। মানুষের থাকা-খাওয়া-জীবন-জীবিকা, ধর্ম-কর্ম-আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস এই সব কিছুরই প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। এগুলির মধ্যে মানুষও যেমন উঠে আসে, তেমনি সমস্ত পারিপার্শ্বিক নিয়ে সমাজও প্রতিভাত হয়। তবে সাহিত্যিককে সমাজসচেতন ব্যক্তি হতে হবে। এবং সাহিত্যক মাত্রেই কম-বেশি সমাজ সচেতন হন। সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, একজন লেখকের রচনায় প্রধানত তার নিজের দেখা, জানাশোনা সমাজের বৈষয়িক ও মানসিক দিকগুলি ধরা পড়ে।

বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ একটি আখ্যানধর্মী কাব্য, যার আঙ্গিকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় লীলার কাহিনি। শ্রোতা-সাধারণকে গল্পরসের আস্বাদন করানোই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে কবির দেখা ও জানা সমাজের নানা চিত্র তাঁর কাব্যে ভিড় করবে, সেটাই স্বাভাবিক। তবে এটা স্বীকার্য যে, তিনি চর্তুদশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই কাব্য লিখেছেন -- সেই মধ্যযুগীয় বাতাবরণে। তখন এখনকার মতো সমাজসচেতনতা গড়ে ওঠেনি। সমাজের অন্তরঙ্গ চিত্র দেওয়ার মানসিকতা বা সামর্থ্য তখনো কবিরা পান নি। তাই আখ্যানকাব্য হলেও ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ সমাজের বিচিত্র বহিরঙ্গ চিত্রই দেখতে পাওয়া যাবে।

বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেমের ছবি এঁকেছেন। এক জোড়া গ্রাম্য যুবক-যুবতীর প্রেম-অপ্রেমের ছবি এঁকেছেন। তাই তাঁর কাব্যে কোনো উচ্চশ্রেণির সমাজের চিত্র পাওয়া যাবে না। এ সমাজ একেবারে লৌকিক দরিদ্র গোপপল্লীর সমাজ, গোপপল্লীর দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় সেই সমাজ প্রতিবিম্বিত হয়ে অবিকৃত রূপে উঠে এসেছে। সেই সমাজের স্থূল রুচি, গ্রাম্যতা, বাদানুবাদ, গলাগলি ও গালাগালি – একেবারে অকপট ও একান্ত নিরাভরণ ভাবে উপস্থিত হয়েছে কবির কলমে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে ইতস্তত ছড়ানো সমাজজীবনের টুকরো টুকরো যে সব চিত্র পাওয়া যায়, সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল –

রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঃ-

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ প্রধানত গ্রাম্য গোপপল্লীর মধ্যযুগীয় সমাজই প্রতিভাত হয়েছে। কোথাও গ্রাম্য সমাজ ছাড়া জমিদারতন্ত্রের পরিচয় নেই। তবে দেশে একজন রাজা ছিল এবং তার কাছে অন্যায়-অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা ছিল। আর রাজাও যথাযথ ব্যবস্থা নিতেন -- তা রাধার বিভিন্ন উক্তিতেই বোঝা যায়। কৃষ্ণ যখন রাধাকে বলাৎকারে উদ্যত হয়, তখন রাধা রাজা কংসের ভয় দেখায় এই বলে–

(i) ‘শুনিলেঁ কংস মরিআঁ জাইবি আপন করম দোষে।’

(ii) ‘‘এবেঁ কাহাঞিঁ ভৈল আতি বড় দুরুবার।
যাণাইবোঁ কংস যেন করএ বিচার।।’’

এছাড়া কৃষ্ণ মহাদানী সেজে রাধার কাছে পথ শুল্ক চেয়েছে। ঘাটোয়াল সেজে ‘কংসের নিযুক্ত ঘাটোয়াল’ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং সেকালে রাজাদের নিযুক্ত বিভিন্ন শুল্ক-আদায়কারী রাজপুরুষ থাকত, তা অনুমান করতে পারি, ‘হাটদান বাটদান লইলোঁ রাজ ঘরে।’ সেকালে বিনিময়ের মাধ্যম ছিল কড়ি।

বৃত্তি ঃ-

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ সেকালের মানুষের জীবন ধারণের জন্য জীবিকার নাম-মাত্র পরিচয় আছে। সেকালে বৃত্তি অনুসারেই জাতি গড়ে উঠেছিল।

‘গোপ’ জাতির কথাই কাব্যে বহুবার প্রসঙ্গত এসেছে। এদের কাজ গো-পালন ও দুধ, দই, ঘোল প্রভৃতি বিক্রি করা। পুরুষেরা গোপালন করত, গোষ্ঠে গরু চরাত এবং মেয়েরা হাটে দুধ, দই বিক্রি করতে যেত।

এছাড়া বিভিন্ন খণ্ডে তৈলী, নাপিত, কুমোর, বৈদ্য, বেদে, যাদুকর, মাঝি, বেনে, চণ্ডাল, স্বর্ণকার, যোগী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, আচার্য, মজুর প্রভৃতি বৃত্তিধারীদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সেকালে সকলে নিজ নিজ বৃত্তি অণুসরণে বাধ্য ছিল -- অন্য কাজ করলে সমাজ শাসন নেমে আসত। এই অনুমান করা যায়, কারণ আইহনের মাকে বড়ায়ি অভিযোগ করেছে – ‘রাধা গোআলের কাম্ ছাড়ী করে বিপরীতে।’

পোষাক-পরিচ্ছদ ঃ-

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ প্রধানত দরিদ্র গোপপল্লীর কথাই পাওয়া যায়। তবে কিছু কিছু সচ্ছল গোপ পরিবারও ছিল। সচ্ছল হলেও গোপবধূদের কায়ক্লেশে দিন যাপন করতে হত। কিন্তু বিচিত্র অলংকার পরিধানে তাদের সকলেরই সাধ ছিল। তাই দেখা যায় গোপবধূ রাধা সোনার চুপড়ী ও রূপার খড়ি পরেছে, গলায় গজমতী বা সাতেসরী হার পরেছে, কানে রত্ন কুণ্ডল পরেছে, হাতে রত্নজড়িত বলয়

অথবা কঙ্কণ পরেছে। সেকালে মেয়েরা পায়ে নুপুর পরত, কটিতে কিঙ্কিণী পরত। তখনকার মেয়েরা নানা ফুলের বিভিন্ন অলংকার পরত। সিঁদুর, লোহা, চন্দন, কাজলও ব্যবহার করত। বসন বা শাড়ীর উল্লেখও কাব্যে আছে। কৃষ্ণের রূপের বর্ণনায় দেখা যায়, সে বিচিত্র ধরনের অলংকার পরেছে। পুরুষরাও কাজল, চন্দন, কানের কুণ্ডল, গলায় গজমতি ব্যবহার করত। কৃষ্ণ ষোলো হাত 'পাটলে'র বস্ত্র পরত। এই বর্ণনা অবশ্যই সম্পন্ন গৃহস্থের। এর থেকে অনুমান করা যায়, সেকালের সকলেই অল্পবিস্তর অলংকার পরত। অন্তত কবি তাঁর দেখা বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজ থেকেই এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছেন, যা শুধু গোপপল্লীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

খাদ্য-দ্রব্য ঃ-

কাব্যে খাদ্যদ্রব্যের সবিশেষ উল্লেখ নেই। প্রায় সর্বত্রই দুধ-দই-ঘোল, এই তিনটি জিনিসেরই উল্লেখ আছে। বংশীখণ্ডে রাধার এলোমেলো রন্ধনের মধ্যেও অনেকগুলি খাদ্যদ্রব্যের নাম মেলে। যেমন – চাল চড়িয়ে ভাত, নিমঝোল, অম্বল, শাক, পরল ভাজা প্রভৃতি। এছাড়া আনন্দ বিনোদনের সময় লোকে সুপারি ও পান খেত, কর্পূর ব্যবহার করত। এছাড়াও লেবু, শাকর অর্থাৎ চিনির উল্লেখ আছে।

আসবাবপত্র ঃ-

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' গৃহ-সজ্জার জন্য আসবাবপত্রের তেমন উল্লেখ নেই। তবে দুধ-দই বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো পাত্র বা ভাত তরকারী রান্নার বা রাখার মতো পাত্র, উনুন বা তরকারী কাটার অস্ত্র নিশ্চয়ই ছিল। কাব্যে পালঙ্কের উল্লেখ আছে। এছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে তেল বহনের কেড়ুয়া, খাপর, ভাত নাড়ার কাঠি, দুধ নাড়ার কাঠি, ঘটি, ভাণ্ড , চুপড়ী, শিকিয়া, বেণ্ডুয়া ও ন্যাতা ইত্যাদির কথা।

কাব্যে কিছু অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখও আছে -- কৃপাণ, ত্রিশূল, কামান, বান, শর, ধনু, লগুড় বা লাঠি।

আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা ঃ-

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সেকালের খেলাধূলা বা আমোদ-প্রমোদের অল্পস্বল্প বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন কৃষ্ণ 'হাথে বাঁশী করি গেন্ডু খেলাওঁ গোকুলে।' গেণ্ডু হল কাঠ বা কাপড় টুকরো দিয়ে তৈরি বল। এছাড়া 'চাঁচড়ী' ও 'খেড়ী' নামক দুটি খেলার উল্লেখ আছে।

আমোদ-প্রমোদের সময় বা প্রেম প্রণয়ের নিবেদনে সেকালে লোকে কর্পূরবাসিত তাম্বুল খেত। দল বেঁধে নৃত্য-গীতাদিরও উল্লেখ আছে। খরতাল ও বাঁশি বাজানোর কথা আছে। প্রমোদকাননও নির্মাণ করত কেউ কেউ।

পশুপাখি, জীবজন্তু ঃ-

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' নানা পশুপাখি, জীবজন্তুর নাম আছে। যেমন -- গরু, মাকড় অর্থাৎ বাঁদর, উট, হরিণ, ভেক, শিয়াল, ময়ূর, কাক, তাম্বাচূড় বা কুক্কুট, ছাগল, সাপ, শকুন ইত্যাদি।

ধর্ম-কর্ম ঃ-

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' সেকালের মানুষের ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে তেমন নিবিড় পরিচয় নেই। তবে চণ্ডীপূজার বিশেষ প্রচলন ছিল – কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য বড়ায়ি রাধাকে চণ্ডীপূজা করতে বলেছে –

'বড় যতন করিআঁ চণ্ডীর পূজা মানিআঁ তবে তারে পাইলেঁ দরশন।।'

এছাড়া নানা দেবতার সঙ্গে রামচন্দ্রের প্রভাবও সমাজে পড়েছিল। কারণ কাব্যের তাম্বুল খণ্ডে নামহীন দেবকথার সঙ্গে শ্রীরামের নাম উল্লিখিত। বড়ায়ি কৃষ্ণকে সে কথা জানিয়ে এবং কৃষ্ণের প্রেম প্রস্তাব নিয়ে দেবগণকে বন্দনা করে ও শ্রীরামচরণে ধ্যান করে রাধিকার সন্ধানে গেছে। আর কাব্যের সর্বত্র দেবী বাসলীর কথা কবি নিজেই বলেছেন। বাসলী লৌকিক দেবী। কবি বড়ু চণ্ডীদাস নিজেই তাঁর সেবক। অর্থাৎ সেকালে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সাথে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবী যেমন বাসলীর পূজাও সাড়ম্বরেই হত।

স্বর্গ-মর্ত – পাপ-পুণ্য বোধ ঃ-

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি ধর্মীয় অনুশাসনের উল্লেখ আছে। সেকালে লোকের বদ্ধমূল ধারণা বা বিশ্বাস ছিল – পুণ্যকর্মে লোকে স্বর্গে যায়। নানা স্বর্গীয় সুখ ভোগ করে। পাপ করলে নরকে যায় ও নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করে। অর্থাৎ স্বর্গ-নরক ও পাপ-পুণ্যের ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে মানুষের মধ্যে দৃঢ়ীভূত ছিল। 'রাধাবিরহ' অংশে তার উল্লেখ পাই –

"পুণ্য কইলেঁ স্বগ্গে জাইএ নানা উপভোগ পাইএ
পাপে হএ নরকের ফল।"

পাপ করলে তার প্রায়শ্চিত্তের কথাও কাব্যে বলা হয়েছে। বাণ খণ্ডে রাধাকে বান মারার জন্য কৃষ্ণকে বড়ায়ি বলেছে –

"মোরে নাঞি ছোঁ কাহ্নাঞি বারানসি যা।
আঘোর পাপে তোর বেআপিল গা।।"

সেকালে মানুষ ছিল ভাগ্য নির্ভর। বিশ্বাস ছিল -- কপালে যা লেখা আছে, তা খণ্ডিত হবে না – 'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ'।

স্ত্রী-হত্যাকেও সেকালে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শতাধিক ব্রাহ্মণ আর অগণিত গরু মারলে যে পাপ হয়, স্ত্রীবধ তারও অধিক বড়

পাপ --

''শতেক ব্রাহ্মণ আর মারিলেঁ গোকুল।

সে পাপ সহো নহে তিরী বধ তুল।।''

স্ত্রী বধ করলে সকলেই তাকে ঘৃণা করত, একঘরে করত। এই সুযোগেই সেকালের নারীরাও ভয় দেখিয়ে পুরুষদের বিচলিত করত।

সামাজিক সংস্কার বিশ্বাস ঃ-

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের কাব্য। তাই মধ্যযুগীয় নানা সংস্কার বিশ্বাসে কাব্যটি পূর্ণ। তার মধ্যে কিছু পড়ে লৌকিক আচার-বিচার, আর কিছু পড়ে কুসংস্কার ও বিধি নিষেধের মধ্যে। নানা সামাজিক কুসংস্কার, যেমন -- হাঁচি, টিকটিকি, কাকের ডাক, শূণ্য কলসী, ডান বা বাম শেয়ালী, তেলা বা ভিখারী বা যোগী দর্শন -- এগুলি সবই ছিল অমঙ্গলসূচক। কাব্যে এই রকম লৌকিক কুসংস্কারের ছড়াছড়ি। সেকালে শুভতিথি, শুভবার ও শুভক্ষণ দেখে মানুষ ঘর থেকে বেরত –

''কোণ অশুভ খনে পাঅ রাঢ়ায়িলো।

হাঁছি জিঠী আয়র উঝঁট না মাণিলোঁ।।''

....

কান্দে কুরুআঁ লআঁ তেলী আগে জাএ।

সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ।।''

আবার আরেক শ্রেণির লোকবিশ্বাস অশুভ বলেই ধরা হত। যেমন --

''ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী।

জল মাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী।।

....

জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ।।''

অর্থাৎ ভাদ্রমাসে চতুর্থীর রাতে জলে চাঁদ দেখা, মাটিতে জল দিয়ে অক্ষর লেখা, জলপূর্ণ কলসীতে হাত ঢোকান, গুরুর আসনে চেপে বসা -- খুবই অশুভ বলে তখন মনে করা হত। বস্তুত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পরবর্তী বিভিন্ন মধ্যযুগীয় অনুবাদ কাব্য ও মঙ্গলকাব্যেও এমনি সব অমঙ্গলসূচক লোকবিশ্বাস উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, সেকালের মানুষ এগুলিকে পরম যত্নে এড়িয়ে চলত।

পারিবারিক ও সামাজিক শাসন ঃ-

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। একটি ক্ষুদ্র পরিবারে কুলবধূ রাধা, স্বামী আয়ান ও শাশুড়ি বর্তমান। কিন্তু শাশুড়ির দাপটে ঘরের বধূ বাইরে যেতে পারত না। রাধা বলেছে –

''আহ্মার সাসুড়ী বড়ায়ি বড় খরতর।

সবখন রাখে মোরে ঘরের ভিতর।।''

সেকালের বধূদের কোনো স্বাধীনতাই ছিল না। কিন্তু এই গৃহকর্ত্রী বা পরিবারের কেউ সমাজবিধি লঙ্ঘন করলেই, তাকে একঘরে করা হত। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' শাশুড়ি রাধাকে হাটে যেতে অনুমতি না দিলে, অন্যান্য গিন্নীরা এসে তাকে একঘরে করবার মতলব এঁটেছিল।

সামাজিক জীবনের আদর্শ ঃ-

কাব্যে দেখা যায় সমাজের জীবনের আদর্শ কী হবে, তাও সমাজপতিরা নির্ধারণ করেছিল। সেকালে অনেক বিষয়ে সমাজচ্যুতি ঘটত। যেমন --

''কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হআঁ দুঠমনে। প্রবল হৈআঁ সূদ্রে লংঘিব ব্রাহ্মণে।।

পুত্রে বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে। পুণ্য লংঘিব জনে হআঁ পাপমনে।।''

– এগুলি উল্টে দিলেই দেখা যায় কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের কথা লঙ্ঘন করবে না, পুত্র পিতার কথা, শিষ্য গুরুর কথা, স্ত্রী পতির কথা কোনোদিন লঙ্ঘন করবে না। তেমনি কেউ আশ্রিতকে বধ করবে না, দাতা দান করে দানগ্রহীতাকে অত্যাচার করবে না -- এগুলি সমাজের মানুষ মাত্রই মেনে চলবে। মধ্যযুগীয় এই সমাজ-আদর্শ আজও এদেশে প্রচলিত আছে।

এইভাবে বড়ু চণ্ডীদাস তার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সমাজ জীবনের প্রচুর খণ্ড খণ্ড চিত্র উপস্থাপণ করেছেন, যা থেকে কবির সমকালের দেশকাল ও সমাজের বাস্তব চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তাই সামাজিক ইতিহাস রচনায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র গুরুত্ব অপরিসীম। সমকালীন সমাজজীবনের একটি বাস্তব চিত্র হল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য তুর্কি বিজয়োত্তর মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের একটি প্রামাণ্য ও একমাত্র ঐতিহাসিক সামাজিক দলিল।